দ্বিখন্ডিত ঃ তসলিমা নাসরিন

রঞ্জন রায়

তসলিমার দ্বিখন্ডিত নিষিদ্ধ হবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মুখ্যমন্ত্রী আরও পঁচিশজনখ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীর অনুমোদনের পিছে সওয়ার হয়ে নিষিদ্ধকরণের নির্দেশনামা জারি করলেন। শঙ্কর কথা বইটির কয়েক পাতা নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে মহামিলনের মক্কা এই পশ্চিমবাঙলায়! অথচ বি
ধ হিন্দু পরিষদ ওয়াটার ছবির শুটিং বারানসীতে বন্ধ করে দিলে আমরা একই মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে শুনতে পাই মুক্ত চিন্তার সপক্ষে কলরবমুখর তার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য মাধা খুঁড়ে হাজির করতে হয়। বস্তুত ছাব্বিশ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে যে সিদ্ধান্তই শীর্ষস্থানে নেওয়া হোক না কেন সমর্থন জুগিয়ে যাবার দায় যাদের তাদের বিবেকবোধ এর সপক্ষে এক মেদন্ডহীন বশ্যতাই নিজেদের ভেতর প্রজনন করতে থাকেন, এবং এই কর্কটরোগ দলের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা নিপায় ক্ষোভে লক্ষ করি চারপাশ কি মসৃণভাবে এই দ্বিচারিতার অভ্যেসকে আত্মস্থ করে ফেলছে। আমরাই কি এর বাইরে ?

এই বইটির বিদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে কোথাও আমরা দেখতে পাই না মুসলিম মৌলবাদীদের রণহুঙ্কার বা তাদের সাথে সাধারণ মুসলিম জনগণের সংগঠিত হবার লক্ষণ। কারণ সমস্ত ধর্মের বিদ্ধে তসলিমা তার অবস্থান অনেক আগেই ঘোষণা করেছেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। ইসলাম তার বাইরে নয়। বাঙলাদেশে এই নিয়েই তিনি জীবনকে বাজী ধরেছিলেন। তাই যারা আমরা মুক্তবুদ্ধির সপক্ষে তারা হয়তো স্বাভাবিক সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে নিষিদ্ধকরণ বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের বিদ্ধে মুসলিম ভোট নিজের কোলে টানবার কৌশলমাত্র।

কিন্তু এই বাহ্য ! এই বইতে তসলিমা আসলে এক মূল্যবোধকে হাজির করেছেন যার সঙ্গে এই উপমহাদেশের সমাজ মানসের গভীর অমিল। এই মূল্যবোধকে এক বিদেশী ধারণা হিসেবে আমরা বৌদ্ধিক জগতে ভোগ করি সিনেমা, থিয়েটার বা বিদগ্ধ জনমন্ডলীতে যথেষ্ট দূরত্ব থেকে। এ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক বন্য ফল্গুধারা। টেকনোলজির হাত ধরে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাল্টে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের চেনা ভোগের জগত, তার ভাবমানস। খসে পড়ছে মানব সম্পর্কের বহিরঙ্গের নানা আবরণ। মনের গহনের অনেক ডুবো পাহাড় ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির সীমায়। পাল্টে যাচ্ছে অস্তিত্বের স্বাধীনতার বোধ - নিয়ন্ত্রণহীন, অপ্রতিহত। পুরোন শতাব্দীর স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সমন্বয়কে বোধের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসবার আগেই যেন আমরা ভেসে পড়েছি উজানে। তসলিমা বোধহয় এ বইয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিজেকে সঁপে দেবেন এই খরস্রোতে । তাই এ বই সম্বন্ধে আসল প্রতিক্রিয়া সম্ভবত আমাদের নিয়ন্ত্রণশাসিত চেতনার প্রবল অস্বস্তিসঞ্জাত। ভালো মন্দের বিচার করবার আগেই হয়তো এই অপরিচয়ের সামনে আমরা কুঁকড়ে রয়েছি।

তসলিমা যেন এ বই -এ নগ্ন হয়ে এই স্পর্শকাতরতাকেই ছোবল দিতে চেয়েছেন। তার হাতিয়ার আবেগের জগতেউপলব্ধ এক অমার্জিত সত্য। যে সত্যের মাপকাঠিতে তিনি নিজেই নিজেকে হাজির করেছেন বিদীর্ণ বিপ্রতীপ

বহুখন্ডে। কখনও তিনি ধর্মের দানবের সামনে দাঁড়িয়ে অকুতোভয় । কখনও স্নেহের কাঙ্গাল। তখনও দাণ স্বেচ্ছাচারী। কখনও দয়িতের মুত্যুতে ভঙ্গুর ধ্রুবতারার মত একটি মন্ত্রই তিনি আঁকড়ে ধরেছেন ---যা অনুভবযোগ্য তারকিছুই গোপনীয় নয়।

এ বই -এর একটি গুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে শিল্প সাহিত্যের জগতের বহু খ্যাতনামা ব্যত্তি সম্পর্কে তসলিমার অভিজ্ঞতার কথা। এই অংশটিও তুলেছে প্রবল বিতর্কের ঝড় এখানে কেউ কেউ তার অতি ঘনিষ্ঠ। কেউ বা একটু দূরের। তসলিমার মনে হয় ঘনিষ্ঠতাকামী সব পুযেরই আসল লক্ষ্য তার শরীর। দ্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের তিত্ত পরিসমাপ্তির পর তিনি নিজেই খোলাখুলি জানাচ্ছেন বহু পুযের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা। সমস্ত সামাজিক বাধানিষেধ তিনি হেলায় উপেক্ষা করেছেন। বিয়ে করছেন, বিয়ে ভাঙছেন বারবার। কিন্তু এর মধ্যেই তার মনে হয় মুঠোর মধ্যে কোনও মেয়ে মানুষ এসে গেলে তাকে আর মাথা ছাড়াতে দিতে কোনও পুযেরই ইচ্ছে করে না।

আমরা দেখি তসলিমার অন্য এক হয়ে ওঠা। আরমানিটোলায় একা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। দ্রর সঙ্গে দেখা। নিয়ে এসেছেন তাকে সেই বাসায়। দ্র চোখ মেলে দেখে আমার সুখের সংসারটিকে। কেমন দেখছো আমার সংসার ! দ্র বলে, তুমি পারোও বটে। পারবো না কেন। ইচ্ছে থাকলেই হয়। অনেক আগেই এই ইচ্ছেটি করা উচিত ছিল আমার । নিজের বাড়ি। নিজের টাকা। কেউ নাক গলাবার নেই। কেউ আদেশ দেবার নেই। কি করছি না করছি তা নিয়ে কৈফিয়ত দেবার নেই। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে বল !...

দ্রকে সে রাতে আমিই বলি আমার বাড়িতে থেকে যেতে। ... যখন সে একটু একটু করে আরও ঘনিষ্ঠহতে চায়, দিই তাকে ঘনিষ্ঠহতে। যেন সেই আগের দ্র, আমি সেই আগের আমি। ... দ্রকে তা চাইলেও ভাবতে পারি না সে আমার আপন কেউ নয়। বিয়ে নামক জিনিসটিকে অদ্ভুতুড়ে একটি ব্যাপার বলে মনে হয়। বিয়ে কি সত্যি কাউকে আপন করে, অথবা বিচ্ছেদই কাউকে পর করে। ইচ্ছে হয় বলি, যতদিন ইচ্ছে থাকো এই বাড়িতে, এটিকে নিজের বাড়ি বলেই মনে করো।
যদি কখনও ইচ্ছে হয় এখানে আসতে, এসো। খুব সহজ কণ্ঠে বলি।
দ্র ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে।
তোমার ওই যে প্রেম চলছিল, সেটি চলছে এখনও ?
দ্র ম্লান কণ্ঠে বলে হ্যাঁ চলছে।
বিয়ে টিয়ে শিগগিরি করছো নাকি ?
করব।
ম্লান একটি হাসি ঠোঁটের কিনারে এসেই মিলিয়ে যায়।
তসলিমা হয়ে উঠছেন প্রবল স্বাধীন এক আমি এবং ভয়ঙ্কর একাও। প্রেমের মিলনেও কাঁটার সত্যের মত তার শিয়রে জেগে আছে নিশ্চিত দেয়াল।

এই রত্তাত্ত রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিরাসত্তি কখনও তাকে নিজের লেখালেখি বা পুরস্কার সম্বন্ধেকরে তোলে শ্লেষে তির্যক। আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে আমি স্পষ্ট বুঝি বইটি (লজ্জা নান্দনিক বিচারে সত্যিই নিকৃষ্ট) নিজের অহমিকা বোধ সম্পর্কে নির্মম। মা আমার স্বাধীনতায় কোন বাদ সাধেন না। কেবল তাঁর প্রতি আমার দুর্ব্যবহার তাঁকে কাঁদায়। তাঁকে যাযাবর করে। মা এখানে আমার ধমক খেয়ে অভিমান করে অবকাশ -এ আশ্রয় নেন। অবকাশ -এ বাবার ধমক খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসেন। মার স্থায়ী কোন জায়গা নেই বসবাসের।... আমি লক্ষ্য করি না মার প্রতি ব্যবহারের বেলায় আমি আমার অজান্তেই আমার বাবা হয়ে উঠি। বাবার প্রতি আমার সমীহ বরাবরই ছিল, আছে, যতই তিনি নিষ্ঠুর হন না কেন। তাঁকে নিষ্ঠুর বলে গাল দিয়েছি, কিন্তু তাঁর প্রতাপের প্রতি গোপনে গোপনে শ্রদ্ধা ছিল বোধহয়, যা

কখনও বুঝিনি যে ছিল। তাই যখনই আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, যখনই স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে জীবনে, তখনই আমার অজ
ান্তেই আমি ছোটখাট বাবা হয়ে উঠি। প্রতাপশালী ক্ষমতাবান। ...
আনন্দ পুরষ্কার ঘোষণার পরে মনে করেন সাহিত্যিক জগতের অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে আমার, তাই বলে তো আমি সাহিত্যিক হয়ে যাই নি। ... লেখক হিসাবে যেমন নিকৃষ্ট আমি, মানুষ হিসেবেও তেমন।

পুরস্কারের চিঠি পাওয়ার পরপরই পুরস্কার গ্রহণ করার সম্মতি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আনন্দবাজার -এ। ... আমি ইচ্ছে করলেই কি বলতে পারতাম না যে আমি যোগ্য নই এই পুরস্কারের, আমি নেব না পুরস্কার। পুরস্কার নিতে অস্বীকার করার জন্যও যে স্পর্ধা দরকার হয়, সেই স্পর্ধাটি আমার নেই কেন ! জীবনে স্পর্ধা করে তো অনেক কিছুই করেছি। ভেতরে কি একটি লোভ কাজ করছে না আমার ! ... লজ্জা ভয় সব কিছুর তলে খুব গোপন একটা লোভ আমাকে নিভৃতে কামড়ায়। অপরাধীর মত একটি অন্যায়ের দিকে আমি যেতে থাকি, ,,, নিঃশক্তি, নিঃসহায় আমিটি সজোরে নিশ্বাস নেয় নির্লোভ হতে। আমি অশ্লীল শব্দ লিখি, আমি যৌন লেখিকা, নগণ্য লেখিকা, লেখালেখির কিছুই জানি না, আমি কিছু না, আমি কিছু না শুনে শুনে, অবমাননা আর অসম্ভ্রম পেয়ে পেয়ে নিজে ভুগতে ভুগতে আত্মীয় স্বজনকে ভোগাতে ভোগাতে যদি হঠাৎ শক্ত কিছু মাটি পাই, মাথাটি, যে মাথাটি বারবার নুয়ে নুয়ে যায় লোকের ভর্ৎসনা আর বিদ্রুপে, উঁচু করে দাঁড়াবার, অসম্মাননা ছুঁড়ে ছুঁড়ে যারা আমাকে অচ্ছুত করেছে, তাদের যদি দেখানোর সুযোগ হয় নিজের সামান্যও সম্মান, তবে আমি সুযোগটি কেন ছেড়ে দেব ! পায়ের তলায় মাটি যতটা শক্ত হলে দাঁড়ানো যায়, তার চেয়েও বেশি শক্ত করে মেয়েমানুষকে দাঁড়াতে হয় - আমার মেয়েমানুষ পরিচয়টিতে তাই আমি একটি অহংকার জুড়ে দিতে চাই, যে অহংকারটি আমাকে কারও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া থেকে, দূর দূর করে তাড়ানো থেকে, চোখ মুখ নাচিয়ে কৌতুক করা থেকে বাঁচাবে, বাঁচাবে আর সাহিত্যের জগতে, যে জগতে আমার বিচরণ, যে জগতটি মূলত পুষের, স্থান দিতে বাধ্য হবে। আমি নির্লোভ হতে পারি না।
কেন এই মেয়েটির বিকাশের সঙ্গে অহংকার, লোভ জড়িয়ে যায় ? শত আত্মানুসন্ধান, আত্মনিগ্রহও তাকে এর হাতথেকে মুক্তি দেয় না ? কারণ, ধর্মের বিদ্ধে কলম তুলে নিয়ে তাকে সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার সামনে। কিন্তু চলে যায় না ওরা ... কলিং বেল চেপে ধরে রাখে। ...দরজায় লাথি কষা, কলিংবেল চেপে রাখা কিছুই থামছে না। আমি কুলকুল করে ঘামছি। ইন্টারকম কাজ করছে না। ফোন ডে ড ।এই ন তলা থেকেচিৎকার করে কাউকে ডাকলে কেউ শুনবে না। দরজায় যত রকম ছিটকানি আছে কব্জা আছে সব লাগিয়ে মিনুকে নিয়ে আমার লেখার ঘরটিতে গিয়ে দরজা বন্ধকরে বসে থাকি। ওদিকে সদর দরজাটি ভেঙে ফেলতে চাইছে ওরা। ভেঙে ফেলবে, তারপর যে ঘরে বসে আছি, সে ঘরের দরজাটিও ভেঙে ফেলবে, তরপর। পাঁচজন আমার হাতপা মাথা চেপে ধরে থাকবে, একজন পাঞ্জাবীর তল থেকে রামদা বের করে আমার গলাটি কাটবে। আমিদু-হাতেগলাটি আড়াল করে রাখি। শরীর শিথিল হতে থাকে। শিথিল হতে হতে নুয়ে পড়তে থাকে, কুঁকড়ে শুয়েথাকি মেঝেয়। মিনু, কালো মিশমিশে হাড়গিলে দাঁতাল মেয়েটি (কাজের মেয়ে + আপন ফুফাতো বোন) আমার মাথার কাছে নিঃশব্দে বসে থাকে। আমরা কেউ কারও শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাই না। প্রচন্ড ঘুম পেতে থাকে আমার।

ধর্মের নিপীড়নের বিদ্ধে মুখ খুলে তিনি নিজভুমে পরবাসী। স্বাধীনভাবে বাঁচবার প্রবল আকঙ্খায় যখন তিনি বাসা ভাড়া করে আছেন, বাবা তাকে তুলে নিয়ে এসে আক্ষরিক অর্থে কয়েদ করছেন বাড়িতে। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে। যে মেয়ে হাঁটতে বাধ্য হয় এমন আগুনের ওপর দিয়ে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কি হতে পারে সাধু সন্তের মতো ? তা কি ছাড়াতে পারে চন্দ্রাতপ ? নাড়ী ছিঁড়ে অস্তিত্বের সতত দহন সম্ভবত তাকে দিয়ে গেছে বিরল ও দংশনপ্রিয় এক আত্মমুক্তি। তাই তার সঙ্গে কিছু ভাগ করে নিতেগেলে আমাদেরও গায়ে বিঁধবে কাঁটা। প্রখর তাপে মুখও ঝলসে যাবে খানিক। তসলিমাকে তার সত্ত্বার ভেতরথেকে বুঝতে গেলে এ প্রস্তুতি আবশ্যিক।

তার স্বাতন্ত্র্যের আছে বহু ভাঙা কোন। প্রথম প্রেমিক দ্রের সঙ্গে জীবনযাপনে ব্যর্থ হয়ে তিনি পরপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন পুষ সম্পর্কে । ভেতর থেকে কুরে খাওয়া এক অতৃপ্তি সম্ভবত কখনও তাকে করে তুলছে সুবিধাবাদের অংশীদার। আমাকে একবার জুয়োর নেশায় পেয়েছিল, তা অবশ্য খুব বেশিদিন টেঁকেনি।... শেখানো খেলা খেলতে গিয়ে দেখি এক পশলা দেখা দিয়েই হাওয়াই মিঠাইয়ের মত উবে যায় আমার টাকা। প্রতিবারই মনে হয় বুঝি জিতব। আর প্রতিবারই গাদা ট াকা হেরে আসি।... আমাকে নিরীহ পেয়ে লোকেরা আমাকে ঠকাচ্ছে এই কথাটি আমার বোঝার সাধ্য ছিল না, কিন্তু ব াবার হস্তক্ষেপে দাদা জ্ঞানদান করে করে আমাকে সরিয়েছেন জুয়ার আড্ডা থেকে। জুয়া খেলার ফলাফলের দায়িত্ব তিনি অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন নিজেকে নিরীহ ঘোষণা করে। যেবাবা - দাদার সঙ্গে তার সমস্ত স্বাধীন সিদ্ধান্তের মৌল বিরোধ তাদের ছত্রছায়া দরকার হয়ে পড়ছে জুয়োর হাত থেকে মুক্তি পেতে। এত অসম লড়াইয়ে যিনি বুক পেতে একা দাঁড়িয়ে থাকেন এই সামান্য ব্যাপারে বাবা দাদার মত অভিভাবক তার দরকার হয় কেন ? এখানে আসলে তিনি সত্যিই অন্য এক তসলিমা - দুর্বল, অন্যকে দায়ী করে রেহাই পেতে চাইছেন কৃতকর্মের দায় থেকে।

বহু মানুষ সম্পর্কে পরপর দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে যাচ্ছেন তিনি। এ শহরের লোকরা যতীন সরকারকে দেখলে পথ ছেড়ে দাঁড়ায় আশীর্বাদ করে। তবে একজনই একবার দেখেছি মোটে ফিরে তাকান নি। তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়।... বিকেলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য যতীন সরকার আর ছড়াকার প্রণব রায়কে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি বাড়িতে। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর সৈয়দ হক কী কেমন আছেন ? এই বাক্যটিই শুধু আওড়েছিলেন তিনি। শক্তি সৌজন্য করেও দুটো কথা বললেন না। সৈয়দ হক আর শক্তি নিজেদের মধ্যেই কথা বলে গেলেন। যতীন সরকার আর প্রণব রায় চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে চা বিস্কুট খেয়ে কিছু করার নেই বলে টেবিল থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন । চমৎকার সাহিত্যের আড্ডা জমানোর উদ্দেশ্যটি আমার সম্পূর্ণই বিফলে গেল। শক্তি সারাক্ষণই বড় বড় ঢেঁকুর তুলছিলেন । সম্ভবত গতরাতে মদ্যপান অতিরিক্তই হয়েছে। কি জানি মদ্যপানে এরকম উদ্ভট রকম ঢেঁকুর বেরোয় কি না। শক্তির অসামাজিকতার প্রচুর গল্প চালু হয়ে আছে বাজারে । হয়তো সত্যিই তার ব্যবহার অনেক আন্তরিক হতে পারতো। তসলিমা এতে ন্যায্যতই ক্ষুব্ধহতে পারেন ।কিন্তু সেটা কি ঢেঁকুরের সঙ্গে মদ্যপানের সংযোগ ঘটিয়ে শক্তির সম্পর্কে বল্গাহীন অনুমানের অধিকার দেয় ?

তার ভাষা মাঝে মাঝেই ডিঙিয়ে যায় স্বাভাবিক সৌজন্যের সীমা। শাহরিয়ার সে মাঠেই পরিচয় করিয়ে দেয় নাইমের সঙ্গে।... কিলো পঞ্চাশেক ওজনের শরীরে এই এতটুকুন নিতম্ব।
--- বা নাইমের মা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, সুন্দরীর স্বামীটি অসুন্দরের ডিপো।

বহু পুষের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, প্রচলিত নীতি নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। এই বন্ধুর যাত্রায় গরলের ভ াগও খুব কম হয় না। কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে থেকে গরলের দায়ভাগ কি চাপিয়ে দেওয়া যায় সঙ্গীর ঘাড়ে ? উতল হাওয় ায় তসলিমা এ দায় চাপিয়েছিলেন দ্রের ঘাড়ে। যদিও দ্র তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা সম্পর্কে সচেতনভাবে কখনই তসলিম াকে অন্ধকারে রাখেন নি। এ বইতেও তসলিমা বহু পুষ আসঙ্গের গরলের সমস্ত দায় চাপিয়েছেন বিপরীত লিঙ্গের ঘ াড়েই।

সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক। দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আমার ভগ্ন হৃদয়ের শুশ্রূষা করার দা য়িত্ব শামসুল হক নিজে থেকেই নিয়েছিলেন। হক রাঙামাটিতে হোটেলে দুজনের জন্য একটি ঘর ভাড়া নিতে চাইলে তসলিমা সম্মতি দেন। অথচ ভেতরে ভেতরে তাকে সন্দেহ করেন। কাপ্তাই -এ লোকের সামনে হক তসলিমার পরিয়য় দেন কন্যা বলে। তখনও তসলিমা সব মেনে নেন। আবার হক একটিই ঘর ভাড়া নিলে সারারাত কাঁপতে কাঁপতে আল াদা বিছানায় শুয়ে কাটান। অথচ হক কিন্তু এর মধ্যে অন্য কিছু করার চেষ্টা করেন নি। নিজেই তসলিমা বলেছেন --- সৈয়দ হক হয়তো কোন কু - মতলব নিয়ে বেড়াতে যান নি। অথচ তার সম্বন্ধে তসলিমা পরপর পরস্পরবিরোধী মন্তব্য

করে যান। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের নাম খেলারাম খেলে যা। বড় দক্ষ তুলিতে এঁকেছেন খেলারাম বাবর আলীকে। লুইট্ট্যা বদমাইশ বলে যে বাবর আলীকে সকলে গাল দেয় সেই বাবর আলীর চরিত্রটি যে সৈয়দ শামসুল হকের ভেতরের চরিত্র, তা অনেকটা পথ তাঁর সঙ্গে না চললে আমার সম্ভবত অনুমান করাহত না। অথচ কিছু পরেই তিনি লিখেছেন এই সৈয়দ হকই খবরের কাগজে আমাকে দিয়ে কলাম লেখানোর জন্য নাইমকে পরামর্শ দিয়েছেন। এই দেবতার মত লোককে তারপরও সবসময় দেবতার মত বলে মনে হয় নি আমার। কিন্তু সে কেবল মনে না হওয়ার ব্যাপ ারে, তাঁর কোনও অশ্লীলতা, ভাল যে আমার কখনও দেখতে হয় নি।

এবং দ্র যখন জীবনে নেই তখন এক এক করে মিলন, নাইম, মিনারের সঙ্গে হল শরীরের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। এ খেলায় অ ামার সুখ হলেও তাদের সুখই ছিল প্রধান। কলকাতায় জালালের সঙ্গেও তিনটে রাত কেটেছে বিচিত্র সম্ভোগে। ... মদ্যপান করতে করতে কথা বলছিল সে, ভোর হবার আগে আগে মদ্যপান শেষ হলে হঠাৎ আমাকেই আমূল পান করতে শু করে। আমি না বলি না। না বলি না এই কারণে যে, তিনি প্রথমে বলছেন জালালের সঙ্গে বিচিত্র সম্ভোগে রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু একটু পরেই বলেছেন এর মধ্যে তার কোন অংশ ছিল না। যেন তিনি দয়াকরেছেন ! মিলন, নাইম ও মিনারের সঙ্গে সম্পর্কে তিনি স্বেচ্ছায় ঢুকছেন। অথচ বলছেন তাদের সুখই প্রধান। প্রেমে অন্ধ সম্ভোগরত দুটি মানুষ ম ানুষীর শরীরও সবসময় সমানভাবে সাড়া দেয় না। কিন্তু একজন যদি আরেকজনের শরীরের সাধ মেটাতে অনিচ্ছায়ও কখনও সম্মতি দেয় ও পরে তাই নিয়ে অভিযোগ করে তবে কি স্বাভাবিক ভদ্রলোকের চুক্তি লঙিঘত হয় না ? ভাল না ল াগার দায়ভারও কি দুজনেই সমান ভাগ করে নেবেন না, যদি তারা সম্পর্কটিকে স্বীকার করেন ?

মেয়েদের অধিকারের স্বপক্ষে তো বটেই, শরীরে স্বাধীনতার স্বপক্ষেও তসলিমা সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠ। নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, এ শরীর আমার, শরীর সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বও আমার । শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার অন্য কোনও উপায় যদি আমার জানা থাকত। তবে নাইমের সঙ্গে মাসে একবার কি দুবার যে সম্পর্কটি হয়, হত না। ত ারপরও হয়েছে, ইচ্ছে করেছি বলে হয়েছে।

শরীরী অনুভব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি আগেই রপ্ত করেছেন খরভাষা। তাই এ বইয়ে উল্লেখ করেছেন এক পুরোন কবিতার কথা নিয়তি। -- চোখে / ঠোঁটে / চিবুকে / উন্মাতাল চুমু খেতে খেতে / দুহাতে মুঠো করে ধরে স্তন / মুখে পে ারে, চোষে / তৃষ্ণায় আমার রোমকূপ জেগে ওঠে / এক সমুদ্র জল চাই, কাতরায় / ।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তসলিমা কোথাও থেকে যান খানিকটা মেয়ে। যে মেয়ে যুগযুগান্ত অবদমনের ভারে ভালমন্দের সকল দায় নিতে পারেন না নিজের কাঁধে। যতই বিশুদ্ধ হোক না তার স্বাধীনতার আকাঙ্খা, পরিবেশের অসাম্যের বিপুল চাপ তাকে কোথাও করে রাখে একটুখানি ন্যুব্জ। মেয়ে পুষের সম্পর্কের কাঁটার ভার পুষের ওপর না চাপিয়ে স্বস্তিপান না। নিজেকে দুর্ভাগ্য ভাবার সামান্য লোভটুকু পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না। এবং সে কারণেই হয়ে ওঠেন বেশ খানিকটা পুষবিদ্বেষী। কিন্তু এরকম কি কোনও পুষ আছে হাতের কাছে কোনও রমণী পেয়েওকামগন্ধহীন রাত কাটাতে পারে । নেই হয়ত। তাই এ বইয়ের একটা বড় অংশে তসলিমাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয়।
বাঙলা রেনেসাঁস সাহিত্যের জগতে হাজির করেছে আকাশচুম্বী সব ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁরা কেউ আত্মজীবনী লিখতে উৎস াহী হলেন না। বাঙলায় প্রথম আত্মজীবনী তাই লিখতে হলো একজন মেয়েকে --- রাসসুন্দরী দেবী। একটু তলিয়ে ভ াবলে হয়তো মনে হবে সাহিত্য শিল্প বা যে কোন মনস্বিতার জগতের স্বাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করার জন্য মনের যে মুক্তির প্রয়ে াজন তা পুষতান্ত্রিক সমাজ কখনও সাধারণভাবে মেয়েদের দিয়ে উঠতে পারে না। তাই অবদমনের বিপক্ষে তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে নিজের কথা বলবার তাগিদ । হয়তো সাহিত্য রচনা সুদুর পৃথিবীর চেয়ে তারকাছে অনেক বেশি কাম্য তখন কলমের ডগায় নিজের জীবনকে তুলে ধরবার প্রয়াস। তসলিমার আত্মজীবনী রচনা মূলে ও কি আছে এরকমেরই এক তাগিদ ?

তসলিমার পুষ বিদ্বেষ আমরা দেখলাম। অথচ এই তসলিমাই কি মর্মস্পর্শীভাবে আঁকতে পারেন অবদমিত শ্রেণীর প্রতিনিধি এক পুষের চিত্র। তার গাড়ির চালক সাহাবুদ্দিন। একবার তিনি সভয়ে জানিয়েছিলেন, কিছু অচেনালোক তাকে প্রতিদিন খুঁজতে আসে গ্যারেজে। সাহাবুদ্দিনের ভয় ওই অচেনা লোকগুলো আমার কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অ াসে তাঁর কাছে। সাহাবুদ্দিনকে শাসিয়ে যেতে আসে, যেন আমার গাড়ি না চালায় বা গাড়ির ভেতর গোপনে বোমা র াখতে আসে। ... সাহাবুদ্দিন ... আমাকে রক্ষা করেন আমাকে না জানিয়ে। তাঁকে কোনওদিন বলিনি কি হচ্ছে দেশে অ ামাকে নিয়ে। তিনি খবর পান কি হচ্ছে। তিনি যে জানেন তা আমাকে জানতে দেননা । আমাকে বলতে হয় না যে রাস্তায় মিছিল বা সভা হচ্ছে আমার বিদ্ধে সেদিকে না যেতে । তিনি অন্য রাস্তা ধরেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুরে যাচ্ছেন কেন ?
বললেন, ওদিকে আজকে মিছিল আছে।
কিসের মিছিল ?
সাহাবুদ্দিন চুপ। তিনি জানেন না যে আমি জানি কিসের মিছিল হচ্ছে।
কারা মিছিল করছে ?
ওরা ভালো লোক না।
সাহাবুদ্দিনের সংক্ষিপ্ত উত্তর। এদিকে ভাল লোকের মিছিল হচ্ছে না,ওদিকে আমার যাবার দরকার নেই।
গাড়িতে তেল লাগবে ?
না।
গাড়ির তেল ধীরে খরচ হয়। যেটুকু চলে গাড়ি, সেটুকুই খরচ।
সাহাবুদ্দিন আপনার টাকার দরকার আছে ? টাকা লাগবে কিছু ?
না।
আপনার ছেলে বলেছিলেন মেট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে । যদি কখনও দরকার হয় কিছু বলবেন।
আমার লাগবে না।

অত্যাচারিত স্বাধীনতাকামী এক মেয়ে, যে তার সমান শ্রেনীর একজন পুষকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাঝেও দেখবেন বত্রদৃষ্টিতে, কি মরমী মানুষের মত তিনি অনুভব করেছেন সামাজিকভাবে নগণ্য এক পুষের প্রবল আত্মসম্মানবোধকে !
আর এক পুষসঙ্গী কায়সার। যাকে, তসলিমা ব্যবহার করেছেন ইচ্ছেমত। কিন্তু কায়সারের অসহায় বউ হেনুর কাছে তসলিমা স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য হারিয়ে ফেলেছেন। একদিন কায়সারের বউ হেনু আমাকে ফোন করে বলেছে, কি করে অ ামার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক করেন ? আপনার লজ্জা হয় না ? আপনি না মেয়েদের কথা লেখেন। তবে আরেক মেয়ের সর্বনাশ করেন কেন ? আমি ক্ষণকাল বাক্যহারা বসে ছিলাম। হেনুকে কোন উত্তর দিতে পারি নি। এরপর শুকনো গলায় বলেছি, আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন, তাকে ফেরান। তাকে বলেন যেন আমার কাছে আর না আসে।
ছোড়দার ছেলে সুহৃদ মানুষ হয়েছে তসলিমাদের ভিটে ময়মনসিংহে। তাকে শেকড় থেকে ছিঁড়ে ছোড়দার স্ত্রী গীতা নিয়ে গেল ঢাকায়। সেখানে বাড়ীর লোকেরা সবাই অনাকাঙ্খিত। সুহৃদের প্রতি তাদের ভালবাসার অবদমনকে বর্ণনা করতে গিয়ে তসলিমা গীতাকে আঁকলেন দানবের আকারে।

অর্থাৎ পুষ বা মহিলা নয়, যেখানেই সামান্য অবদমনের সম্ভাবনা সেখানেই তসলিমার ভেতর থেকে উৎসারিত হয় ত্রে াধ। তাতে তিনি হয়ে পড়েন খানিকটা একদেশদর্শী । প্রভুত্বের সামনে তসলিমা যেমনই উদ্ধত, দুর্বলের সামনে তেমনই দুর্বল।

ছোটবেলা থেকে মুখচোরা এক মেয়ে সমাজের কাছে ভোগ করেছেন যৌন লাঞ্ছনা, ধর্মের নামে লাগামহীন অবদমন।

সহ্য করতে করতে তার পিঠ গিয়ে ঠেকেছে দেয়ালে। তসলিমা বাধ্য হয়েছেন মেয়ে পরিচয়ের খোলস ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে। মেয়েদের অধিকারের স্বপক্ষে কলম ধরতে গিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন স্বতন্ত্র আচরণবিধি স্থির করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছেন, তার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে উল্কার গতিবেগ। সেই গতি তাঁকে ঠেলে দিয়েছে অপরিচিত কন্টকিত এক কুয়াশাময় অঞ্চলে। যেখানে নিজের আচরণও যেন অনেক অংশে অপরিচিত। নিজের অবদমিত অস্তিত্বই য়েন সেখানে তার সামনে হাজির হচ্ছে অন্য এক তসলিমা হয়ে ।এই বোধ সম্ভবতঃ তাঁকে করে তুলেছে আত্মসংশয়ী। বিশুদ্ধ আবেগের কাছে নিষ্ঠাবান তসলিমা হয়তো তাই ব্রত নিয়েছেন সবার সামনে নিজেকে নগ্ন করে মেলে ধরবার। হয়তো তিনি চান তাঁর এই তীব্র গতিময় জীবনকে সকলের আয়নায় আগুনের আঁচে পরখ করে নিতে । আমরা খাটো মাপের মানুষেরা, যাদের প্রতিদিন নিজের কাছেই লুকোতে হয় অনেক কিছু, গভীর শ্রদ্ধায় অনুভব করি এই সততার ধারণাকে।

ঘেরাটোপের এই জীবনে তসলিমার অনন্যতা স্বীকার করে নিয়েও একটি প্রশ্ন থেকে যায় ---দ্বিখন্ডিত কতদূর সাহিত্যগুণ সমন্বিত ? আত্মকথনের অনাস্বাদিতপূর্ব দলিল হয়েও দ্বিখন্ডিত সম্ভবতঃ এই চৌকাঠ পেরোতে পারেনি। নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশের যে সাম্য ভাষাকে দেয় সংহতি, তার অভাব এখানে প্রকট। বর্ণনাভঙ্গী বহু সময় এতই অসংস্কৃত যে বিরক্তি উৎপাদন করে। আত্মকথনের মাত্রা অতিক্রম করে লেখাটি অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে পুরনো খবরের কাগজের ধারাবিবরণী। আনন্দ পুরস্কার বা লজ্জা সংক্রান্ত বিতর্কের সারবস্তু আমাদের সকলেরই জানা । তার অনাবশ্যক বর্ণনা বা মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্ত ব্যক্তিজীবন বইটিকে করে তুলেছে ক্লান্তিকর রকমের দীর্ঘ । বইটির বহু অংশ তাই সুখপাঠ্য নয়। তবুও বলব, সামাজিক বা ব্যক্তি জীবনের জাড্য যাদের ক্লান্ত করে, এ বই তাদের কাছে হাজির হয়েছে অন্য এক আলো নিয়ে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com